বা সমস্তর সচলতা (Horizontal Mobility) ও উল্লম্ব বা স্তরান্তরিত সচলতা (Vertical Mobility)। সমসামাজিক স্তরের মধ্যেই সমমর্যাদার একটি পদ বা পেশা থেকে অন্যপদ বা পেশায় যাওয়া অনুভূমিক সচলতা (Horizontal Mobility) হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষত্রে পদবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে বটে, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে।

বৃত্তি, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে যদি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার হ্রাস, বা বৃদ্ধি ঘটে তবে তাকে উল্লম্ব সচলতা (Vertical Mobility) বলে। উল্লম্ব সচলতার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরের পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য সামাজিক স্তরে উপনীত হয়। উল্লম্ব সচলতা আবার দু-রকম হয়—ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব সচলতা (Upward Vertical Mobility)—যদি সামাজিক সচলতার ফলে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটে, তবে তাকে ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব সচলতা বলে। আর যদি সামাজিক সচলতার ফল হিসেবে সামাজিক মর্যাদার অধোগতি হয়, তাকে অধোমুখী উলম্ব সচলতা (Downward Vertical Mobility) বলা হয়। কেবল বৃত্তির পরিবর্তন নয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষার মান, রুজি রোজগার, জীবনযাপনের রীতি প্রভৃতি পরিবর্তনের ফলেও সামাজিক মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ উল্লম্ব সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়।

সমাজতত্ত্বের আলোচনা উল্লম্ব সামাজিক সচলতার পথ কে সুগম করে, যথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়ক ভূমিকা, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল কার্যক্রম, সভ্যতার বিকাশ।

জাতিভেদভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতেও (কঠোর হলেও সচল ছিল) উল্লম্ব সামাজিক সচলতা দেখা যায়। তবে ভারতীয়দের মধ্যে এর হার কম। তবে সচলতার ব্যাপ্তি, প্রকৃতি ও গভীরতা ভিন্ন।[১]

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে সমাজের রূপান্তর সাধন :

অশিক্ষিত ও অবহেলিত মানব-মানবীর মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রকৃত মানবিক যোগ্যতা অর্জনের পিপাসা সৃষ্টি করে কাম্য মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। অপরকে মান দিয়ে নিজের মান বাড়ান (পরইপরমেশ্বর), নিজের সহিষ্ণুতা দিয়ে অপরকে সহিষ্ণু ও সহমর্মী করে তোলা এই তাঁদের মানবমুখী আন্দোলনের ধারা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়া ছিলেন। ...তখন তো সাম্য ভ্রাতৃত্বভাব প্রভৃতির কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই...তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল"[২]—কবির এই সানন্দ বিস্ময়ই শ্রীচৈতন্যের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বে পূর্ণ নবীন ধর্মান্দোলনের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

শ্রীচৈতন্য পূর্ব মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্রমোচ্চ গড়নে (Hierarchical Structure) বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ মান ও স্থান ছিল।

তখন ছ-টি জাতিগোষ্ঠী ছিল :

(১) **ব্রাহ্মণ** ঃ (ক) সদ্‌ব্রাহ্মণ- (বৈদিক, রাঢ়ী শ্রোত্রীয় ইত্যাদি), আচার নিষ্ঠাবান।
(খ) বর্ণব্রাহ্মণ- (পতিত, যাঁরা বর্ণশূদ্রের গৃহে পূজা করতেন) যথা সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ (সুবর্ণ বণিকদের বাড়ি যাঁরা পূজা করতেন) আচার্য ব্রাহ্মণ ও অগ্রদানীরা।

(২) **বৈদ্য ও কায়স্থ**-সৎশূদ্র ও উত্তম সংকর।

(৩) **নবশাখ-সৎশূদ্র ৯টি জাতি**-"তিলি, মালী, তামুলী, গোপ-নাপিত, গোছালী, কামার, কুমার, পুঁটলী ইতি নবশাখাবলী।" এবং আরও ৫টি (শঙ্খবণিক বা শাঁখারি, কংসবণিক বা কাঁসারি, তন্তুবায় বা তাঁতি, মোদক ও মধুনাপিত)-মোট ১৪টি জল আচরণীয় জাতি।

(৪) **অজলচল** (এঁদের হাতে ব্রাহ্মণদের বা সৎশূদ্রদের জল চলত না। বর্ণব্রাহ্মণ দ্বারা এঁরা পূজা-আর্চা করাতেন।

(৫) **নবশাখা ও অজলচলের মধ্যবর্তী জল আচরণীয়**—এঁদের কাজ করত বর্ণব্রাহ্মণেরা, সদ্‌ব্রাহ্মণেরা নয়।

(৬) **অন্ত্যজ।**

সামাজিক মান ক্রমান্বয়ে ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য (অব্রাহ্মণদের সংস্কৃত পড়াতে পারতেন এবং অব্রাহ্মণ শিষ্যরা শুরু হিসাবে গ্রহণ করতেন), কায়স্থ ও নবশাখদের। অন্ত্যজরা ছিলেন অসম্মানিত, সমাজে প্রায় ব্রাত্য। এঁরা মুসলমান হয়ে যেতেন প্রায়শই ইসলামি শাসকদের প্রলোভন পেয়ে বা অত্যাচারে, কখনও ইসলাম সমাজে মর্যাদা পাবার আশায়। এঁদের ধর্মান্তরিত হবার যুক্তিগ্রাহ্য প্রবণতা ছিল।[৩] বৃহদ্ধর্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ৩৬ টি সংকর জাতি বা মিশ্রবর্ণের উল্লেখ আছে। সমাজে এদের সেরকম সম্মান ছিল না। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শ্রেণির সমশ্রেণিতে (ব্রাহ্মণের) যে মর্যাদাগত উন্নয়ন ঘটালেন (Sublimation) একে বলে সমস্তর সচলতা (Horizontal Mobility)। আবার বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিভুক্ত সামাজিক স্তর বিন্যাসগত ক্রমনিম্ন পর্যায়ের (Lower rung of the hierarchical order) কিছু অসামান্য ভক্তিমান মানুষ শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রেরণায় উন্নীত হলেন বৈষ্ণব গুরু বা মহান্ত রূপে। তাঁরা বহুমান্য হলেন। যেমন-কায়স্থ রঘুনাথ দাস গোস্বামী। নরহরিদাস ঠাকুর-বৈদ্য। সদ্ গোপ-শ্যামানন্দ। নরোত্তম দাস (কায়স্থ)। যবনরা শ্রীচৈতন্য সংস্পর্শে প্রেমী সাধক ভক্ত হয়ে হিন্দু সমাজে মর্যাদা পেলেন। যথা-যবনঘরে পালিত ভক্তোত্তম হরিদাস ঠাকুর। এটি ক্রমোচ্চ সচলতা (Vertical Mobility)। কখনও এটি একাধিক পুরুষ ধরে নানা প্রজন্মে সঞ্চারিত। যেমন মুরারি গুপ্ত (বৈদ্য) ও (যবন) হরিদাসের বহুমান্য বৈষ্ণবভক্তে রূপান্তর 'প্রজন্মান্তর্গত সচলতা' (Intragenerational Mobility)।

শিবানন্দ সেন (বৈদ্য), তাঁর পুত্র পরমানন্দ সেন, শ্রীচৈতন্য ও রামদাস সেনের সামাজিক সম্মাননার ক্ষেত্রে তা বহু প্রজন্ম বাহিত সচলতা (Multigenerational Mobility)। বৈষ্ণবান্দোলনের ও শ্রীচৈতন্য প্রভাবে সমাজের নানাস্তরে নানাবৃত্তির অসংখ্য মানুষের জীবন সম্পর্কিত আশা আকাঙ্ক্ষা (aspiration) ও আদর্শ (ideas) বদলে গিয়েছিল আমূল। তাঁদের বৃত্তি পরিবর্তন (জগাই মাধাই চরিত্রহীনতা, অসৎপথে রোজগার 'তোলা' দস্যুবৃত্তির পথ থেকে সৎ সেবা (যথা-স্নানের ঘাট নির্মাণ) মানবধর্মপরায়ণ মানুষে, রূপান্তর রত্নাকর নাপিত তাঁর (নাপিত বৃত্তি ছেড়ে বৈষ্ণব) হয়েছেন। চিরাচরিত সামাজিক স্তর থেকে এসে ভিন্ন গোষ্ঠী (dissident group) সব স্তর থেকে এসে আসা যথা গোবিন্দ কর্মকার (কর্মকার), রামানন্দ রায় (কায়স্থ) পুরুষোত্তম আচার্য বা স্বরূপ দামোদর (ব্রাহ্মণ) শ্রীচৈতন্য সেবক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেন এবং এই রূপান্তরে তাঁরা আরও সামাজিক মর্যাদা লাভ করলেন। জাতি-বর্ণ ভেদের প্রথাশাসিত বাঙালী ও ওড়িয়া, দক্ষিণী হিন্দু সমাজ জড়ত্বের শিলাস্তূপকে ভেঙে সামাজিক সচলতার জীবনস্রোতকে নতুন খাতে বইয়ে দিল। এর চরম লক্ষ্য শুদ্ধাভক্তি লাভ। এই সচলতার শক্তির দূরবিস্তারী সামাজিক প্রভাব অনস্বীকার্য। এর ফলে সমাজে জাতি বর্ণের নতুন বিন্যাস ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' বর্ণিত বর্ণের ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস হল এইরূপ (৬) শূদ্র →(৫) বৈশ্য →(৪) ক্ষত্রিয় →(৩) ব্রাহ্মণ →(২) যতি→(১) বৈষ্ণব। গদাধর দাস (কাটোয়া ও আড়িয়াদহ) আড়িয়াদহের এক কাজীকে বুদ্ধিপ্রয়োগ করে হরিনাম বলান।

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্য পাঠান বিজলী খাঁকে বৈষ্ণব করেন এবং তার এক সঙ্গী পীরকে নাম দেন রামদাস। এ দুটি (Vertical Mobility)-র দৃষ্টান্ত (পাঠান বিজলী খাঁর ক্ষেত্রে)। নরোত্তম দাস (দত্ত) ঠাকুর কায়স্থ শুরু হন। ইনি উপবীত (পইতে) পরতেন, যা ব্রাহ্মণদের স্মারক। অধুনা বাংলাদেশ তখন অবিভক্ত বাংলার রাজসাহির অন্তঃপাতি খেতুরীয় মহোৎসবে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী স্বয়ং কায়স্থবর্ণোদ্ভূত নরোত্তমকে গুরু বলে সম্মান জানান। এটি যথার্থই সামাজিক সচলতার দৃষ্টান্ত কারণ নরোত্তম ত্যাগ, তিতিক্ষা বিদ্যা ও সাধনায় সাধক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিলেন। নবশাখ, যেমন তাম্বুলি, শাঁখারি, গন্ধবণিক, মালাকার, গোয়ালার বাড়ি শ্রীচৈতন্য যান ও তাঁদের পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন। তাঁদের নিজের নিজের বৃত্তি ছিল নিজেদের সামাজিক স্তরে স্থিত। তাঁরা, তাঁদের উত্তরসূরিরা পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য সংসর্গের জন্য ঐতিহাসিকভাবে মর্যাদার অধিকারী হলেন।

গোপ ও তেলীদের মধ্য হতে সদ্‌গোপ ও তিলি জাতির উদ্ভব। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসব বৈষ্ণব মন্দির তৈরি হল ও বৈষ্ণব বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছিল তার শতকরা ২৮ ভাগ বৈষ্ণব মাহিষ্য, তেলি, সদ্‌গোপেরা স্থাপিত করেন। ফলে এঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নিত্যানন্দ প্রভু নবশাখ, অজলচল, এদের মধ্যবর্তী জাতি (জলচল), অন্ত্যজ জাতির মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম প্রসার করেন। সপ্তগ্রামের ধনী সুবর্ণবণিক অজলচল উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ইনি 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' বর্ণিত (কবি কর্ণপূর রচিত) দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'সুবাহু গোপাল' রূপে বিশেষ মর্যাদা পান। "মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।

সর্বভাব সেবে নিত্যানন্দের চরণ।" নিত্যানন্দ এঁর হাতের রান্না খেয়েছেন। এঁর নেতৃত্বে সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিকেরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। এই স্বতন্ত্র ধনশালী গোষ্ঠী-সমাজে বিশেষ মর্যাদা পান। আর একটি স্তর মূলজাতি থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন বৃত্তি নিয়ে নেয়। ধোবা শুঁড়িরা যেমন হয় মধু নাপিত (dissident group, new aspiration) চাষা ধোবা (সৎচাষি), পরবর্তীস্তরে শুঁড়ি (শৌণ্ডক, মদ্যবিক্রেতা) সাহা শুঁড়িতে পরিণত হয়। এইভাবে নিম্নবর্ণের ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায়, তাদের ধর্মান্তকরণ প্রবণতা কমে ও সামাজিক মান মর্যাদা বাড়ে।

এক পুরুষ সচলতা (Intragenerational Mobility)

শ্রীবাস ও তাঁর চার ভাই, গদাধর দাস, খোলাবেচা শ্রীধর, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, কাশী মিশ্র, গরুড় পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, নকুল ব্রহ্মচারী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, কমলাকর পিপলাই-এঁরা এর নিদর্শন।

বহুজন্মবাহিত সচলতা (Multigenerational Mobility)

শ্রীচৈতন্য পরিকর কুলীন মাধবদাস বা ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়, তস্য পুত্র বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পুত্র চৈতন্য দাস, তস্য পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দনপুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব গোস্বামী (এঁরা বাঘনাপাড়ার গোস্বামী)-প্রত্যেকেই পণ্ডিত ও সার্থক পদকর্তা, সাধক বৈষ্ণব গুরুরূপে সম্মানিত। এঁদের ক্ষেত্রে এসেছে সমস্তর সচলতা (Horizontal Mobility)।

নিত্যানন্দ শাখার কংসারি সেন, তস্যপুত্র (বৈদ্য) সদাশিব কবিরাজ (নাটকে কাচসজ্জাকারী), তস্যপুত্র পুরুষোত্তম দাস তস্য পুত্র কানু ঠাকুর (জাহ্নবা নিত্যানন্দের পোষ্য পুত্র) সদাশিব কবিরাজ (পুত্র পুরুষোত্তম দাস) গৌর পরিকর। এঁরা যশোহরের বোধখানা ও নদীয়ার ভাজনঘাটের গোস্বামী। এঁদের ক্ষেত্রে হয়েছে স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতা (Vertical Mobility)।

নারীর সম্মান বৃদ্ধি

সামাজিক সচলতা যত বাড়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা তত বৃদ্ধি হয়। জাহ্নবা দেবী, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতা দেবী (অদ্বৈত পত্নী), মালিনী (শ্রীবাস পত্নী), হেমলতা ঠাকুরাণী (শ্রীনিবাস আচার্য কন্যা), গঙ্গা দেবী (নিত্যানন্ত কন্যা), সুভদ্রা দেবী (বীরভদ্রের পত্নী, সংস্কৃত স্তোত্র কাব্য অনঙ্গকদম্বাবলীর রচয়িত্রী) গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তথা সমগ্র বঙ্গীয় সমাজে বহুমান্যা। জাহ্নবা দেবী, সীতা দেবী দীক্ষাদাত্রী-মা গোঁসাই হেমলতা ঠাকুরাণীও তাই। এবার শ্রীচৈতন্যচরিত সাহিত্যে চিত্রিত বিশিষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলির সামাজিক সচলতা ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের একটি সারণি দেওয়া হল, বিষয়টিকে স্পষ্টতা দেবার জন্য—

সারণি

শ্রীচৈতন্য সাহিত্যে চিত্রিত বিশিষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলির সামাজিক সচলতা ও অর্থনৈতিক বিন্যাস।

ক্রমিক নং	নাম	জাতি	অর্থনৈতিক বিন্যাস	সামাজিক সচলতা
১।	যবন হরিদাস সচলতা (উচ্চস্তর)	যবন	দরিদ্র, ধনী যবন গৃহে পালিত	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
২।	পাঠান রাজকুমার বিজলী খাঁ, সেই বিজলী খান হইল মহাভাগবত সবতীর্থে হইল তার পরমমহত্ব।	যবন রাজপুত্র	বিত্তশালী ধনী	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৩।	উদ্ধারণ দত্ত; এঁদের জল অচল করেন বল্লাস সেন, আগে পইতে ছিল, সোনা বিক্রয়, ক্রয়ে এঁদের অধঃপতন।	সুবর্ণবণিক	ধনী	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৪।	গোবিন্দ কর্মকার (ঈশ্বর কৃপা জাতি কুলবিদ্যা ধনের অপেক্ষা রাখে না)-বাসুদেব সার্বভৌমকে একথা বলেন শ্রীচৈতন্য। ঈশ্বর পুরীর সেবক। পরে শ্রীচৈতন্য ছায়া সঙ্গী।	কর্মকার, করণ	নিম্ন মধ্যবিত্ত (?)	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৫।	মুরারি গুপ্ত (চৈতন্য সহপাঠী ও প্রথম জীবনীকার সংস্কৃতে)	বৈদ্য	উচ্চ মধ্যবিত্ত	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৬।	নরহরিদাস সরকার	বৈদ্য	উচ্চমধ্যবিত্ত গুরু (আচার্যের সম্মান)	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৭।	গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ (তিনভ্রাতা, পদকর্তা কীর্তনীয়া)	কায়স্থ	মধ্যবিত্ত	উল্লম্ব (Vertical) mobility)

ক্রমিক নং	নাম	জাতি	অর্থনৈতিক বিন্যাস	সামাজিক সচলতা
৮।	রামানন্দ রায় (বিদ্যানগর শাসন কর্তা, শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ), তাঁর পিতা ও ভায়েরা।	কায়স্থ	ধনী	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
৯।	বাসুদেব দত্ত	কায়স্থ	মধ্যবিত্ত	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
১০।	নরোত্তম দত্ত (বীরভদ্র কর্তৃক খেতুরী মেলায় ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা)	কায়স্থ	ধনীগুরু (আচার্যের সম্মান)	উল্লম্ব (Vertical) mobility)
১১।	শ্যামানন্দ	সদ্‌গোপ	উচ্চবিত্ত গুরু	উল্লম্ব (Vertical) mobility) (আচার্যের সম্মান)
১২।	রঘুনাথ দাস গোস্বামী	কায়স্থ	ধনী	ওই, আচার্যের সম্মান (ষড় গোস্বামীদের অন্যতম)।

অনুভূমিক বা সমস্তর সচলতা

(Horizontal Mobility)

ক্রমিক নং	নাম	জাতি	অর্থনৈতিক বিন্যাস	সামাজিক সচলতা
১।	শ্রী সনাতন, সুলতান হোসেন শাহের দবীর খাস, বা প্রধানমন্ত্রী	ম্লেচ্ছ সংস্পর্শী ব্রাহ্মণ (ষড় গোস্বামীর অন্যতম)	উচ্চবিত্ত ধনী	সমস্তর সচলতা
২।	শ্রী রূপ (সুলতান হোসেন শাহের সাকর মল্লিক বা প্রধান আপ্ত সহায়ক)।	ম্লেচ্ছ সংস্পর্শী ব্রাহ্মণ (ষড় গোস্বামীর অন্যতম)	উচ্চবিত্ত ধনী	সমস্তর সচলতা
৩।	শ্রীধর পাটুয়া	মর্যাদাহীন ব্রাহ্মণ	দরিদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	সমস্তর সচলতা

ক্রমিক নং	নাম	জাতি	অর্থনৈতিক বিন্যাস	সামাজিক সচলতা
৪।	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী	মর্যাদাহীন ব্রাহ্মণ	দরিদ্র ভিক্ষুক	সমস্তর সচলতা
৫।	জগন্নাথ রায় (জগাই)	ব্রাহ্মণ পতিত	ধনী	সমস্তর সচলতা
৬।	মাধব রায় (মাধাই) কুখ্যাত সমাজবিরোধী	ব্রাহ্মণ পতিত	ধনী	সমস্তর সচলতা

সমাজের রূপান্তর সাধন, নানা দিকে

জাতীয় জীবনে যখন জাগরণ আসে, তখন তা নানাভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অভিব্যক্তি পায়। বাসন্তী হাওয়ায় যেমন জড় জীর্ণ প্রকৃতিতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে যায়, প্রাণের সে আবেগ ও আনন্দ প্রকৃতি লুকিয়ে রাখতে পারে না।

স্বাধীনতার অনুভূতি, মুক্তির আনন্দ, অবাধ আত্মবিকাশের আশ্বাস, স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা মানুষের মনে জায়গা সে বাসন্তী হাওয়া। সে হাওয়ায় প্রাণ চাঞ্চল্য, নতুন চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ। জাগরণী নতুন স্বপ্ন, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা, মানুষের মনে জাগায় সে বাসন্তী হাওয়া।

সে হাওয়ায় প্রাণ চাঞ্চল্য, নতুন চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ, জাগরণী নতুন স্বপ্ন, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্তি সাধন আর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উদ্যম ও উদ্যোগ সঞ্চার। এই উন্মোচিত সমাজ জীবনেও রাষ্ট্রের এক নব লাবণ্য আসে। এই স্নিগ্ধ শ্রীজাতীয় পরিবর্তন রাষ্ট্রের জীবনে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক ঋদ্ধির সূচক। শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্য পরিকরদের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এক নব প্রাণের সঞ্চার করে আনে, এক ভাবের জোয়ার, নব মানবতাবাদের এক তরঙ্গ জাতির মানসিক চেতনায় বয়ে আনে।

তখন থেকে এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি (১) নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দীক্ষা দেয় প্রচুর পরিমাণে, সংখ্যায় স্বল্প শ্রীপাটগুলি কিছু মাসলমানদেরও দীক্ষা দেন। সকলেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণকারীদের মানসিক নিরাপত্তা দেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীনকালের বৌদ্ধধর্মের মতো উদার মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের মতো ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আনতে পারেনি।

প্রথম সামাজিক উদ্দেশ্য বর্ণলোপ কিন্তু ঢাকা পড়ে যায়। পরবর্তীকালে মূলত বর্ণবিরোধী বৈষ্ণবধর্মে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। আসল নেতৃত্ব চলে যায় শ্রীচৈতন্যের ব্রাহ্মণ পরিকর, সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্টদের হাতে যাঁদের মূল দাক্ষিণাত্যের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণত্ব। তাই বৈষ্ণবস্মৃতি 'হরিভক্তি বিলাস' বর্ণভেদলোপের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সমীকরণ করে সমান্তরাল বর্ণশ্রেষ্ঠতা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সমতা প্রতিষ্ঠার উৎসাহ যোগায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এক নব ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করে—যা তুলনায় বিশুদ্ধতর ও কালের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত। উপবীত ও তুলসি মালার কোন পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু তাতেও সমন্বয়

সাধন হয়নি। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ক্রমে রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কখনও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেনি। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বংশকৌলীন্য প্রথা বজায় রাখলেন। ক্রমশ এ থেকে কৃষিজীবী ও অন্যান্য জাতিবৃত্তিজীবীরা দূরে সরে যেতে লাগল, সৃষ্টি হল জাত বৈষ্ণব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ব্রাহ্মণদের গরিষ্ঠতা নিয়ে শুরু হয়েছিল। তাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব, গরিষ্ঠতা ও আন্দোলনে তাঁদের প্রভাব ছাড়তে চাননি এবং যে কোনো শূদ্রকেই গুরু হিসাবে বরণ করতে চাননি। ব্রাহ্মণ জাতকেই শেষ কথা না মেনে নেওয়া বৈষ্ণব আন্দোলনকে তাঁরা পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের দিকেই ঝুঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ বৈষ্ণবধর্মে এসে বিশুদ্ধ হলো, পূর্ণযৌবন পেল (Vaisnavism Bengal) (...ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৫ পৃ. ৩২২)। জাতি, ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিশিষ্ট অস্তিত্ব গড়ে তুলতে ব্যর্থ হল। কারণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আরও কিছু জাতি বিভাগ-নতুন জাতি সৃষ্টি হল-প্রকারান্তে তা জাতিধর্ম ব্যবস্থার গঠনজোড়কেই শক্তিশালী করল।

অব্রাহ্মণ গুরুরা ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দরা গুরুর দাবিদার হওয়ায়, গোঁড়া ব্রাহ্মণরা বাধা দিয়ে পরাজিত হন। তবে শ্যামানন্দ রসিকানন্দ ধারা পারিবারিক গুরুধারা ও পরিবার গুরুপ্রথাকে বর্ধমান করে তোলে।

অপেক্ষাকৃত নীচু জাতিরা (সামাজিক ও আধ্যাত্মিক) তাদের একটি নতুন জাতি বা উপধারা সৃষ্টি করাল যা জাতি বৈষ্ণব নামে পরিচিত হল। পুরোনো জাতি ব্যবস্থাকে যখন ভাঙাই গেল না, এরকম চ্যুতিধারা করল নবপথ অর্জনতা— নতুন সামাজিক স্বীকৃতির চূড়ান্তকরণ হোক না কেন। মেদিনীপুর গোপীবল্লভপুর শ্যামাসুন্দরজীউর মন্দিরের যিনি অধিকারী হন, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বীর বিক্রমদেব, তাঁকে বছরে ৩৫১ টাকা বৃত্তি দেন। এই সনদটি খোদিত আছে ১৭১৫ খ্রিঃ তাম্রফলকে মহান্ত বিচিত্রানন্দ দেব গোস্বামীর কাছে—ওড়িয়া ভাষায় এটি রচিত, ওপরে একটি ময়ূরের ছবি।

১৭৪০ খ্রিঃ জয়পুরের রাজা গোপীবল্লভ মহান্ত বৃন্দাবনানন্দকে বলদেব বিদ্যাভূষণের মারফৎ দুটি গ্রাম শ্যামলী ও সতিঘরা দেন বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির পরিচালনার জন্য। এইভাবে বলদেব বিদ্যাভূষণ গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের প্রভাব সুদূর রাজপুতানা, বৃন্দাবন ও মথুরায় বিস্তৃত করলেন, এ ছাড়াও তিনি গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের পরিচালিত তাঁদের বৃন্দাবন মন্দিরের জন্য কিছু ভূ-সম্মত্তি ও অর্থ-সম্পত্তি (৬৫১ টাকা) আনলেন। রাজপুতানায় বল্লভাচারীরা ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, বলদেব বিদ্যাভূষণ গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের প্রতিনিধি হয়ে (নিজে খণ্ডাইত হয়েও) শ্যামানন্দী বৈষ্ণবদের সঙ্গে রাজপুতানার একটি সম্পর্কসূত্র তৈরি করেছিলেন। গোপীবল্লভপুরের মহান্ত নয়নানন্দ (শ্রী সম্প্রদায়ের গলতা মঠাধীশ সূর্যানন্দ (১৬৭০ খ্রিঃ)-র দ্বিতীয় জন্ম বলে প্রচারিত) (১৬৮৫-১৭১০ খ্রিঃ) মারফৎ শ্রীসম্প্রদায়ও শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের একটি যোগসূত্র হল।[৪]

(২) বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি জনগণের সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন মেটায়। নিম্নবর্ণের

হিন্দুদের দীক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়াকে মন্থর করে। স্থানীয় মানুষদের শিক্ষার জন্য টোল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনাথদের বিনা খরচায় পড়াশোনা করান, সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেবা ও বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি করে। স্থানীয় মুসলমানদের প্রতিও এরা সহনশীল। মুসলমানরাও কোনো কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত। তাঁরা বৈষ্ণবকেন্দ্রে শ্রদ্ধা দেখাতে আসেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠেনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে।

বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি পরবর্তীকালে রাজা, স্থানীয় জমিদার ও নবাবের আর্থিক অনুগ্রহ পায়। যথা মহেশ শ্রীপাট ঢাকার নবাব ওয়াজির শাহ দ্বারা ১৬৩৪ খ্রিঃ ১১৫১ একর জমি দান পায়। নিজস্ব আয়ের সংস্থান রাখেন এঁরা। গোপীবল্লভপুর শ্রীপাঠ শাহসুজা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। বৈষ্ণবদের মহান্ত ও সেবাইতরা কোনো কোনো শ্রীপাটে লৌকিক হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। রোগমুক্তির সঙ্গেও ধর্মীয় তৃষ্ণা মেটানো, মানসিক আশ্রয় দেওয়া ছাড়াও বর্তমান নাগরিক সভ্যতার বিষে জর্জরিত পার্থিব চাকচিক্যে পথহারা মানুষদের মনে এঁরা দিচ্ছেন ত্যাগ ও শান্তির প্রলেপ।

(৩) উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবকেন্দ্র ঘিরে মেলা হয়। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মেলাগুলির আয়োজক বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি বৈভব সামাজিক মর্যাদা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে দেখায়। মেলা উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আসে, স্থানীয় কারিগরদের বস্তু বিক্রয় হয়। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন চলে। বর্ধমান জেলায় বৈষ্ণবমেলার সংখ্যা প্রায় ৪০, যা অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি। এইসব আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েন ও পরিমণ্ডলে গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণব আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল, কারণ বৈষ্ণব গুরু বা মহান্তরা তাঁদের সম্পত্তি সামলানোয় মন দিলেন, কারণ গুরুগিরিসূত্রে জমি সম্পত্তি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও শক্তি দিয়েছিল।

এই অঞ্চলে জাতি (Caste Mobility) সচলতা বা জাতি সরলীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাল ও ভূমিজরা অনুভূমিক সচলতা পেল মহান্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। মহান্তরা তাঁদের বাড়িতে বাৎসরিক নেবার জন্য যেতেন ও বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। ব্রাহ্মণরা এদের ক্রিয়াকর্মে যেত না কারণ এরা ছিল ব্রাত্য। এরাও মহান্ত সংস্পর্শে এসে উচ্চ সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চাইল ও আস্পৃহতা অনুযায়ী অনুভূমিক সচলতা পেল।

১৯৬১ খ্রিঃ গোপীবল্লভপুরের মালরা ভূমিজদের মতো ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করল। গিল্লা কাটিয়া গ্রামে তারা জড়ো হয়ে পবিত্র পইতে পরার ও মদ ছাড়ার শপথ করে। এরা স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা পেল তাদের জঙ্গলভূমি দাবির জন্য।

মল্লক্ষত্রিয় (মাল), বর্গক্ষত্রিয় (বাগ্‌দী), খণ্ডাইতরা (তাঁতবোনা, তেল তৈরি করা) তাঁদের পেশা ছাড়ল, জমির মালিক হয়ে, বৈষ্ণব হয়ে। তারা গোপীবল্লভপুরের মহান্তদের সংস্পর্শে ও সহায়তায় পেল অনুভূমিক সচলতা (Horizontal Mobility)।

সদ্‌গোপ গোপীবল্লভপুরের অধিকারী পইতে পরল ও ব্রাহ্মণ্যক্রিয়া করল। এটি ছিল শ্যামানন্দর আদেশক্রমে, কারণ গোপীবল্লভপুর শ্রীপাটের রসিকানন্দের বংশ

দেবগোস্বামী বংশ যা পবিত্রপদবাচ্য—এঁদের শ্রাদ্ধ করার নিযুক্ত অধিকারী। এই সদ্‌গোপ অধিকারী পারিবারিক পেশা চাষ ছেড়ে দিল-এরা জমিদার হল এবং চাষ বাস 'মাল্লাদার' বা চাষবাস দেখার কর্মচারী নিযুক্ত করল। এতে তারা 'বাবু' পদবাচ্য হয়ে নিজ জাতির চেয়ে ওপরে ওঠার গৌরব ও মর্যাদা পেল। জাতি না পালটেও একই জাতি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বৈষ্ণব হয়ে মর্যাদা অর্জন করল। পেল অনুভূমিক সচলতা (Horizontal Mobility)। আসলে জাতির সামাজিক মর্যাদা কেবল জন্ম নয়, আর্থিক শক্তি ও সংখ্যা নির্ধারণ করে। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণদের মতামতও এ ব্যাপারে নির্ধারক। আসলে যে সব শূদ্রের জমিসম্পত্তি বাড়ছিল, তারা উচ্চ মর্যাদা পাবার জন্য আস্পৃহ হচ্ছিল, স্থানীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তারা সৎশূদ্র নামে আখ্যাত হল। এই ব্যবস্থা জাতিব্যবস্থাকে কিন্তু তেমন আহত করল না।

১৮ শতকে বৃন্দাবন মথুরায় গোপীবল্লভপুরের প্রতিনিধি ছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি খণ্ডাইত, পদবী মণ্ডল। ইনি রসিকানন্দ (মুরারি)র পৌত্র নয়নানন্দের শিষ্য। ইনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। ঢোলপুরের রাজা (গলতা) তাঁকে উপাধি দেন পূজারী ঠাকুর, 'সনদে একটি মৌজা, পানীয়জলের কুয়ো সহ রাজপুর গ্রাম' (মথুরা পরগনা) দান করেন। বৃন্দাবনে গোপীবল্লভপুরের মহান্ত গোস্বামীদের মন্দির আছে।

১৮৮১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমানে বৈষ্ণব = ২৮৬৫২, জনসংখ্যার ৩১.৬২ শতাশ, প্রায় ১/৩ অংশ। মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবপ্রভাব ১৯০১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ১ লাখ। গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণবদের প্রভাব পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সুদূর রাজস্থানেও। পূর্ববঙ্গ ঢাকাতে অধিকাংশ বৈষ্ণব হন বীরভদ্রের প্রচারের ফলে।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্ট হল বাংলা সাহিত্যে যা অক্ষয় সম্পদ। ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যভাষা বিশ্ব সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হল। শ্রীচৈতন্যের মানস সন্তান অজস্র বৈষ্ণব কবি এক নতুন মিশ্র (বাংলা, অবহট্ট ও মৈথিলী) ভাষায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রচনা করেন যা ব্রজবুলি ভাষা বলে চিহ্নিত। বাংলা, হিন্দি, ব্রজভাষা, অসমিয়া, ওড়িয়া ভাষার শব্দ সমন্বয়ে আন্তর্প্রাদেশিক ভাষা ব্রজবুলির জন্ম। এতে জাতীয় সংহতির পথ উন্মুক্ত হল। বর্তমানে জটিলতর জাতীয় সংহতির সমাধানে সূত্র আবিষ্কারে জাতিদিশাহারা, কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্যের অগণিত ভক্ত অনুরাগী হিন্দু-মুসলমান কবিকুল সে সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রেমের বন্যার যে ধারা তা এখনও অব্যাহত, তা থামবে না, অনবদ্য কাব্য ও অন্যান্য রচনার স্রোত থাকবে।

(৫) ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুর সমাজ ছিল আত্মসমাহিত ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে তাঁরা বিস্তৃতি হারান ও সংকুচিত হয়ে পড়েন। এই স্থবীরকরণ তাঁদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধকামনাকে মন্থর করে দেয়। গৌড়ীয় নব বৈষ্ণব আন্দোলন তাতে গতি ফিরিয়ে দেয়, প্রাণ জাগ্রত করে। স্থানুবৎ সমাজকে সচল করার ফলে এই সমাজ হল গতিশীল- 'Welfare State'-এর প্রস্ফুটিত কমল।

(৬) পরপ্রত্যাশা, পরানুকরণ ত্যাগ করে স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত নরনারী আপনার পায়ে ভর দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ায়। যোজনান্তর সংস্কৃতিকেন্দ্র, শাস্ত্র ও সংগীতশিক্ষার চতুষ্পাঠী ও সেই সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, ঘাটনির্মাণ, প্রভৃতি ইষ্ঠাপূর্তি অনুষ্ঠান দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত গ্রামকে একান্নবর্তী পরিবারের মতো গড়ে তোলা হয়। কোনো রাজকীয় সাহায্য তারা তেমন না পেয়েও পরস্পরের সহায়তায় এই সমস্ত কাজ ও প্রতিষ্ঠান পরিচলনা করে। ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল চরিত্রে মনুষ্যত্ব, সেবাকে অবশ্য আচরণীর ব্রত ও অকপট ভক্তিকে পুরুষার্থ জেনে জীবন গঠন করে।

(৭) অস্পৃশ্য ভুঁইমালী ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব মোহান্ত। সপ্তগ্রামের জমিদারের জ্ঞাতিভ্রাতা কায়স্থ কালিদাস তাঁর উচ্ছিষ্ট খান। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা বন্দরা করেছেন তাঁকে। নরহরিদাস সরকারের বৈদ্য বংশধরেরা ব্রাহ্মণদের গুরু হন। 'ঠাকুর' নাম পান। রাজকীয় সহায়তা নেই, আইনের বাধ্যতা নেই, অস্ত্রশস্ত্রের ঝংকার নেই, বলপ্রয়োগের ভীতি নেই, যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের যাদুস্পর্শে মঙ্গলময় রূপান্তর সাধন হয়েছে। জাতির নব অভ্যুত্থান ঘটেছে।

(৮) জাত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবজাতির কেলাসিত হওয়া (Crystalisation) গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর অঞ্চলে ও অন্যান্য অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ঘটনা। উত্তর ভারতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও রাজপুতানায় গোপীবল্লভপুরের মহান্ত গোস্বামীদের ২০টি জেলায় প্রভাব এবং ৩০০টি মঠ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষেও একটি ভাবান্দোলনকে মর্যাদা দেয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে দূরত্ব কমায় নামসংকীর্তন, যা নিজেই একটি আন্দোলন।

(৯) নির্লোম গঙ্গাদাস, খঞ্জভগবান, নন্দন আচার্য, কুষ্ঠী বাসুদেব, চর্মরোগী সনাতন, এইসব প্রতিবন্ধীরা (Handicapped), দরিদ্র শুক্লাম্বর, শ্রীধর, যবন দরজিরা সমাদৃত হয়েছেন এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনে। শিশুরা পেয়েছে ভালবাসা ও মর্যাদা। শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য তরুণী বিধবার সন্তান ধ্যানচন্দ্র মহান্ত ও লেখক শ্রীচৈতন্য কৃপাপ্রাপ্ত শিশু জয়ানন্দ ও পরমানন্দ (কবি কর্ণপূর) বিখ্যাত লেখক হন, কর্মপূর রাজা প্রতাপরুদ্র দ্বারা মর্যাদাপ্রাপ্ত নাট্যকারও। সমাজের সর্বস্তর নতুন মর্যাদা ও অশ্বাস পায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব নব ধর্ম আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাহিত্য সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনে সাহিত্য সৃষ্টির যুগান্তর, সংস্কৃত বাংলা ও অন্যান্য সাহিত্যে যুগান্তর আনে। শ্রীচৈতন্য নিজ প্রবর্তিত ধর্মের দার্শনিক পটভূমি, সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও রাগ মার্গ সাধনার পদ্ধতি নিয়ে বিবিধ প্রসঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌম, রূপ সনাতন, রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই সব তত্ত্বকথা নিয়ে বৃন্দাবন গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থরচনা ও বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এগুলিখে বলা হয় বৈষ্ণবতত্ত্ব কাব্য।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা অবলম্বনে সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িষায় কাব্য নাটক ও প্রশস্তি সংগীত রচনা হতে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্য নয়, সব জাতির মানুষের

অধিকারে এল। শ্রীচৈতন্য নিজে 'শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি শ্লোক লেখেন কথিত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে শ্রীচৈতন্য প্রভাব কার্যকারী হয়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের চরিত্রে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে হিংস্রতা অনেক প্রশমিত হয়। দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ছোটো ছোটো বিষ্ণু পদগুলি মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাবের অভ্রান্ত সাক্ষ্য। কবি কৃত্তিবাস শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী হলেও রামচরিত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণবতার প্রবলতা শ্রীচৈতন্যোত্তর কালে অনুপ্রবেশ করেছে। বাউল গানে ও বাউল সাধনতত্ত্বে শ্রীচৈতন্য প্রভাব প্রগাঢ়তর, এরা শ্রীচৈতন্যকে মহাগুরু বা মহাবাউল বলেন। লোকসাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, লোকগান ও পটে শ্রীচৈতন্য প্রভাব প্রচুর।

স্ত্রী শিক্ষার প্রচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে হয়। বিষ্ণুপুরের রানিরা অবরোধ প্রথাকে শিথিল করেন, স্ত্রী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেন অভিজাত মহলেও। শ্রীনিবাস আচার্য কন্যা হেমলতা দেবী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেত্রীদের প্রভাবে এটি সাধিত হয়।

বৈষ্ণব সহনশীল নম্র, চারিত্রিক শুদ্ধ, অর্থলোভী নয়। এঁরা ভাগ্য নির্ভর নন, ভাগ্য নির্ণায়কের ভূমিকা নেন। ফিরিঙ্গিরাও বৈষ্ণব আন্দোলনকে মর্যাদা দেন যথা- ফিরিঙ্গি পর্তুগীজরা লোচনদাস বা ত্রিলোচনকে কারগার থেকে ছেড়ে দেয় ও নরহরিদাসের কৃপা পায় (উদ্ধবদাস কর্তৃক বর্ণনা 'ব্রজমঙ্গল'-এ) পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিরা বরাহনগর শ্রীপাট বাড়িকে স্বীকৃতি জানায় পরবর্তীকালে।

সর্বোপরি সমাজের সম্যক রূপান্তর সাধিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবন্দোলন সমাজের সম্যক সংস্কার, পুনর্গঠন ও পুনর্যৌবন দান করে :

সমাজের রূপান্তর সার্ধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কতকগুলি সংস্কার সাধন করে।

১। বিবাহ সংস্কারঃ বৈষ্ণবদের মধ্যে বর্ণাশ্রমজনিত জাতি পার্থক্য নেই। তাই নিম্নবর্ণের বৈষ্ণব পুরুষ তথাকথিত উচ্চর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারে (প্রতিলোম বিবাহ)। এ বিবাহ কণ্ঠি বদল করে, তুলসি সাক্ষ্য রেখে হতে পারে, খরচ কম। এটি পূর্বের গার্ন্ধব বিবাহের মতো। আবার বিবাহ বিচ্ছেদও এভাবে হতে পারে। তুলনামূলকভাবে এদের বিবাহ বিচ্ছেদ কম।

২। শ্রাদ্ধঃ— বৈদিক বা স্মার্ত মতে বিশাল ব্যয়বহুল ও আচার বহুল না হয়ে নামকীর্তন ও সহযোগী বৈষ্ণবভোজন দিয়ে প্রবর্তিত হল।

৩। লেখার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদ প্রচার। এই লেখা অন্যন্য প্রদেশ যথা আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্রে নতুন সাহিত্য ধারাকে প্রভাবিত করল।

৪। পূজা অর্চনায় সরলতা-তা ছাড়া শ্রীচৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব-জাত বৈষ্ণবরা আরও উদার ও সরল আচারী হল। ("Bengal Vaisnavism"-বিপিন চন্দ্র পাল, ১৯১৩ খ্রিঃ)।

৫। ব্যক্তির নাম গৌর নিত্যানন্দ বা গৌর নিতাই, নিমাই, নিতাই এর নামে হওয়া বেশি প্রচলিত হল শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে, বৈষ্ণব নাম। তা ছাড়া গ্রামের নাম গৌরাঙ্গপুর,নিত্যানন্দপুর রাখাও শুরু হল। ব্যক্তি ও স্থান নামের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানেও কম বেশি এইসব নাম রাখা হয়।

৬। বৌদ্ধদের বৈষ্ণব হওয়া। বিশাল বৌদ্ধ সমাজের একাংশকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আত্মীকরণ।

৭। ধর্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষা গুণের অধিকার স্থাপন করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনকারীরা। ভাবভক্তির রাজ্যে উচ্চস্থানে আসীনভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম পালনের প্রয়োজনীয়তা নেই। বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রীচৈতন্য বাহ্য ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন রায় রামানন্দ সংবাদে।

৮। ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত তর্কপঞ্চাননেরা কায়স্থ শূদ্র নরোত্তম দত্তের কাছে দীক্ষা নেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ায় সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হয়।

৯। মালদহ গয়েশপুরে সুলতান হোসেনশাহের আরেক প্রধান অনুচর কেশবছত্রীপুত্র দুর্লভ ছত্রীর বীরভদ্র যে প্রচার ও মহোৎসব করেন, তাতে সমাজের সব অংশ হতে দুঃখী কাঙাল একসঙ্গে এসে প্রসাদ পায় ও সংকীর্তনে অংশে নেন। খড়দহে বীরভদ্রের নাম সংকীর্তনে অংশ নেন মহিলারাও। উত্তরবঙ্গে নানা ধর্ম পালন ও মদ্য মাংস খাওয়া ও তন্ত্রচর্চা হত। বৃন্দাবন দাস (২) 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে' লেখেন-যে এরা সবাই পরিবর্তিত হয়ে বৈষ্ণব হয়। তেমনি এই ধরনের গোষ্ঠী ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে তারাও পরিবর্তিত হয়। উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু মুসলমান বৈষ্ণব হয়। রাঢ়দেশে ও একচাকায় (বীরভূমে) মহোৎসবে সাফল্য পান শ্রীনিবাস পুত্র গতিগোবিন্দ, পরমেশ্বর দাস মল্লিক, উড়িষ্যায় গোয়ালা ও ধীবরদের মধ্যে ধর্মপ্রচারক অন্যতম 'পঞ্চসখা' অচ্যুতানন্দ মহান্তি। নিম্নবর্ণের (Subaltern)-দের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক নিত্যানন্দ, গৌরীদাস পণ্ডিত, প্রথম গোপাল অভিরাম রামদাস, বীরভদ্র, কেশবছত্রীপুত্র দুর্লভছত্রী, গতিগোবিন্দ, পরমেশ্বর দাস মল্লিক, গোপাল ঠাকুর, পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ মহান্তি, 'গোপাল' ধনঞ্জয় দাস, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, রসিক মুরারি, উদ্ধারণ দত্ত (সোনার বেনে), নরোত্তম দত্ত (কায়স্থ)।

১০। মল্লরাজদের মধ্যে বীরহাম্বীর বৃন্দাবনে যান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের ফলে বিষ্ণুপুরে গ্রামের নাম হয় দ্বারকা, মথুরা। জলাশয়ের নাম হয় যমুনা, কালিন্দী, শ্যাম ও রাধাকুণ্ড। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ির পূজা বিশালাক্ষী দুর্গা হলেও বৈষ্ণবপ্রভাবে ভোগ হয় নিরামিষ, বলি হয় না।

ঘাটশীলা ও গোপীবল্লভপুরের শাক্ত আগ্রাসী সংহিস দেবী রঙ্কিনীদেবী (ওড়িয়াতে 'রঙ্ক' অর্থে লোভী)। ঘাটশিলার রাজা যখন শ্যামানন্দ সংস্পর্শে বৈষ্ণব হন, এই রঙ্কিনীদেবীও বৈষ্ণব হন, এ পূজায় পশুবলি হয় না। যদিও ঝাড়খণ্ডের গালুডি ও চাকুলিয়ার রঙ্কিনী দেবীর জন্য বলিপ্রথা চালু আছে।

এই অঞ্চলের নরমাংস, পশুমাংস ও মদ্যপ্রেমী জমিদার ও প্রজাদের চরিত্র সংশোধিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে।

মল্লরাজাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক রাজ পরিবার হতে কর্মকার, কুম্ভকার, সাধারণ কৃষক অন্তর্ভুক্ত হল। মল্লরাজাগণ সাধারণভাবে থাকতেন, খড়ের.

চালের গৃহে ছিল রাজভবন। বৈষ্ণব প্রভাবে মল্লরাজদের আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তন হয়। বহু বৈষ্ণবপুঁথি থাকে রাজগ্রন্থাগারে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বৈষ্ণবদের প্রশংসা করেছেন কালকেতুর গুজরাটনগর পত্তনের উপলক্ষে। কালকেতু অরণ্যবাসী আদিবাসী কৃষক। তিনি দেবীর বরে রাজা হয়ে সমাজে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন। যেমনটি আমরা দেখি আদিবাসী মল্লরা বিষ্ণুপুরের রাজা হলেন। মল্লরাজবংশে শ্রীচৈতন্যপূর্ব যুগে হলেও তাঁদের বৈষ্ণব হিসেবে সম্মান প্রাপ্তি, বীর হাম্বীরের পদকর্ত হওয়া, কালকেতুর মতো উলম্ব সচলতা প্রাপ্ত হওয়া লক্ষণীয়।

১৮-১৯ শতকের লালন শাহ ফকির সত্যই বলেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়ে 'গোরা এনেছে এই নবীন আইন দুনিয়াতে। বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে সেই আইনের হিসেব মতে।'

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকর ও অনুরাগী, উত্তরাধিকারীরা পচনশীল, নৈতিকতাহীন, অন্তঃসারশূন্য সমাজকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে রূপান্তর করলেন, ব্যবহার রসে মত্ত বাঙালিকে দিলেন নৈতিকতা, করলেন ভাবশুদ্ধি, আনলেন শুষ্কজ্ঞানের বদলে সফল প্রেমভক্তি, অন্তর পেল পূর্ণতার পথ।

অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলন সমাজের সম্যক সংস্কার, পুণর্গঠন ও পুনর্যৌবন দান করল।

তথ্য সূত্র

১। অধ্যাপক তেওয়ারী, অনিলবরণ ও ড. মহাপাত্র অনাদিকুমার-সমাজতত্ত্ব (Sociology) পুস্তকে সামাজিক সচলতা অংশ-ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ণ, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ১৯৮৮, পৃ. ৪৬০-৪৫।

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (চিঠি, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ)

৩। Sanyal Hitesh Ranjan-Social Mobility in Bengal, Papyrus, 1981, P 114, এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ড. কাননবিহারী গোস্বামী।

৪। Das Bishupada-Some aspects of Socio-economic changes in South Western Frontier Bengal since introduction of Neo-vaisnavism-Firma KLM (1966), P : 81-83, গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট শ্যামানন্দ রসিকানন্দ, অংশটি নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। কর্ণপূর কবি-গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, বিদ্যারত্ন রামানারায়ণ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, মুর্শিদাবাদ ৪র্থ সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১৯২২।

২। দাস বৃন্দাবন, শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত, সরস্বতী ভক্তি সিদ্ধান্ত কৃত ভাষ্য, চতুর্থ সংস্করণ, গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, ১৯৮৪।
ওই তদেব, নাথ রাধা গোবিন্দ সম্পাদিত সংস্করণ, সাধনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭।

৩। কবিরাজ কৃষ্ণদাস-শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অমৃত প্রবাহ ভাষ্য

ও অন্যান্য) ৫ম সংস্করণ, গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, ১৯৯০।
ওই তদেব, সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১০।
৪। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল (সম্পাদনা মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময়) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭১।
৫। মজুমদার বিমানবিহারী (ড.)-শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৯৩৯, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯ (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরীক্ষিত)।
৬। মাইতি রবীন্দ্রনাথ (ড.)-চৈতন্যপরিকর, বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৬২।
৭। রায় প্রণব (ড.) বাংলার মন্দির (স্থাপত্য ও ভাস্কর্য) পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, পুস্তক বিপণি, ২০০০।
৮। Kenedy Melvile T-Chaitnya Movement, Oxford University Press, 1925.
৯। Sen Dinesh (Dr.) Chaitanya and his age, Calcutta, T. P. Mission.
১০। Sen Dinesh (Dr.) Chaitanya and his companions, C.U., 1917.
১১। Chakraborty Ramakanta (Dr.)-Vaisnavism in Bengal 1486-1900), Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta 1985.
১২। ড. বাউর সুখেন্দু কুমার—শ্রীচৈতন্যচরিতসাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনে তাঁদের ভূমিকা—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. কানন বিহারী গোস্বামী ও শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী বাউর, ৺অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী ও ৺শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

(C) Copy right reserved for renowned researcher Dr. Sukhendu Kumar Baur.

Sukhendu Kumar Baur, Netaji Colony (H), Kolkata, West Bengal

নদীয়া জেলার লোকধর্ম : উদ্ভব-বিকাশ ও সাম্প্রতিক অবস্থা

প্রবীর প্রামাণিক

সংস্কৃতি কোনও একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বেশি দিন আবদ্ধ থাকতে পারে না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও মানুষের জীবিকার কারণে একটি বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতি এখন আর সেই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে একথা ঠিক যে, সেই অঞ্চলের গুরুত্বকে কোনও ভাবেই হেয় করা যায় না। তাই বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির উৎস স্থান সম্পর্কে জানার প্রয়োজন আছে। আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু নদীয়া জেলার লোকধর্ম, সেই কারণে নদীয়া জেলার ইতিহাস, ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা প্রথমে সেই আলোচনাতেই অগ্রসর হব।

বর্তমান কালের নদীয়ার সঙ্গে প্রাচীন কালের ভৌগোলিক অবস্থানের তেমন কোনও মিল নেই। গঙ্গা তীরবর্তী নদীয়ার নাম ও সীমার এত পরিবর্তন হয়েছে যে, পূর্বের ইতিহাসের নদীয়ার সঙ্গে বর্তমানের নদীয়ার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য।

পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণে নদীয়ার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীক, রোমীয়, চীনা পরিব্রাজক-কারও বর্ণনায় নদীয়া বা নবদ্বীপের নামের উল্লেখ নেই। অতএব অনুমান হয়, তখন হয়ত নদীয়া বা নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না; কিংবা থাকলেও এত নগণ্য ছিল যে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, পৌরাণিক যুগেও নাকি নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল।

অনুমান করা হয়, নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। তবে এটা নিয়েও বিতর্ক আছে। কোন নামটি আগে হয় এটা এখনও জানা যায়নি। নবদ্বীপ নামের ব্যাখা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারও কারও মতে, নবদ্বীপ বলতে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বোঝায়। প্রখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি এই মতে বিশ্বাসী। তাঁর 'নবদ্বীপ-পরিক্রমাপদ্ধতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।।...
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।।
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম।"

প্রামাণিক, প্রবীর : নদীয়া জেলার লোকধর্ম : উদ্ভব-বিকাশ ও সাম্প্রতিক অবস্থা
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 41-54